দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP 04 1999
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

43

বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি

ডঃ মোহাম্মদ হাননান

১৮৮৫ সালে তৎকালীন বাংলায় প্রথম শুরু হয়েছিল পাবলিক পরীক্ষা। তখন এর নাম ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা। প্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হতো।

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষার প্রথম থেকেই এতে দুর্নীতির ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল। ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় অন্যান্য খবরের সঙ্গে 'আদালতে উৎকোচ প্রদান' ও 'পরীক্ষায় জুয়াচুরি' শীর্ষক সংবাদ নিয়মিতই স্থান করে নিয়েছিল। ১৮৬৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'ঢাকা প্রকাশ'-এ পরীক্ষায় গোলযোগ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্রহীনতা শীর্ষক সংবাদ অন্যতম শিরোনাম হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে ১৫ই জুলাইয়ের 'ঢাকা প্রকাশ'-এ 'পরীক্ষা সম্বন্ধে লেফটেনেন্ট গভর্নরের অভিপ্রায়' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পরীক্ষা ব্যবস্থায় সততার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল।

১৮৮২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'ঢাকা প্রকাশ' নোট বই নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করে এবং ১৯০১ সালের ১৭ই মার্চ 'শিক্ষার অবস্থা' সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে 'ঢাকা প্রকাশ' উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেই থেকেই বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষা এখন সিন্দবাদের সেই রাক্ষসে পরিণত হয়েছে, যে রাক্ষস ঘাড়ে চড়ে বসেছিল যাকে নামাতে সিন্দবাদের নাভিশ্বাস উঠেছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এর নাম হয়েছিল এন্ট্রান্স, আরো পরে পাকিস্তান আমলে এর নাম দেয়া হয় মেট্রিক পরীক্ষা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এসএসসি ও এইচএসসি দুটোই এখন পাবলিক পরীক্ষা বলে পরিচিত হয়েছে। এই পরীক্ষা তার ঐতিহ্য সূত্রেই লাভ করেছে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্নীতি।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে এসএম শরীফকে চেয়ারম্যান করে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্টে (প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে) পাকিস্তানের তৎকালীন পরীক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত হতাশা প্রকাশ করা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, 'বর্তমান পরীক্ষাসমূহ শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ম্লান করিয়া দিয়াছে' (পৃষ্ঠা ১৫৪)।

১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর গঠিত বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টেও (১৯৬৬ সালে এর প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছিল) পরীক্ষায় অসদুপায় এবং দুর্নীতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। হামুদুর রহমান কমিশন অবশ্য পরীক্ষায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং টেবলেটরদেরও সন্ধান পায় এবং তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির সুপারিশ করে। (পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর পরীক্ষায় দুর্নীতির বিষয়টি তার ঐতিহ্যকেই বরাবরের মতো লালন করে এগিয়ে যায়। এ সময় ছাত্রসংখ্যার হার পূর্বের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পরীক্ষায় দুর্নীতির মাত্রাও মহামারীতে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালের ২রা ডিসেম্বর ইডেন কলেজে নকলবাজরা বড় ধরনের হামলা চালিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র লন্ডভন্ড করে দেয়। ১৯৭৩ সালের ৩রা এপ্রিল কুমিল্লায় কলেজের পরীক্ষায় নকলে বাধা দিতে গেলে একজন শিক্ষক গুরুতরভাবে আহত হন। এতে বড় ধরনের গোলযোগ হয়েছিল এবং ৬৪ জন নকলবাজ ছাত্র পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল।

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা তার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (প্রতিবেদন ১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত) এসব লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন, 'সাম্প্রতিককালে পরীক্ষায় ব্যাপক আকারে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে।... এই দুর্নীতি পরীক্ষাসমূহকে প্রহসনে পরিণত করেছে'। (পৃষ্ঠা ১৬৪)।

বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষা অত্যন্ত নাজুক অবস্থার মধ্যে পতিত হয় সামরিক শাসনামলে। ছাত্রদের মধ্যে নানারকম নৈতিকতা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে রাজনীতিবিদদের, শাসকদের, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নীতিহীনতাকে পুঁজি করেই। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতির রাহুগ্রাসের সুযোগ একশ্রেণীর অসৎ ছাত্র পরীক্ষায় ভালভাবেই গ্রহণ করে। যাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা তারাও এর বিরুদ্ধে বলার মতো নৈতিক সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন।

১৯৭৭ সালের ১২ই মার্চ দেশের নানা পরীক্ষা কেন্দ্রেই গোলযোগ হয় এবং গুলিবর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটে। এই প্রথম পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন নিয়োগ দিতে হয় সরকারকে।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো নৈতিক মান হারিয়ে ফেলে ১৯৭৭ সালের ৩১শে মে এবং ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চের সামরিক শাসকদের প্রতি জনগণের হ্যাঁ-না আস্থা ভোটের কেলেংকারি। দেশের ছাত্র-তরুণদের কাছে এ ঘটনা নৈতিকতার সকল ফানুসই উড়িয়ে দেয়। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের প্রহসনের নির্বাচন পরীক্ষা বিষয়ক মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার সামান্য আশাকেও ধ্বংস করে দেয়।

আর এরপর থেকেই দেখা যায়, বন্ধুবান্ধব নয়, স্বয়ং পিতা-মাতাই নকল সরবরাহ করতে সন্তানের জন্যে নেমে পড়েছেন। মূল্যবোধের কতখানি অবক্ষয় ঘটলে এতটা বিপর্যয় ঘনীভূত হতে পারে তা শুধু কল্পনার নয়, আশঙ্কিত হওয়ার বিষয়েই পরিণত হয়।

১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতিতে এই পটভূমিতেই পরীক্ষাসমূহে নতুন ধরনের প্রশ্নমালা উদ্ভাবনের কথা বলা হয়। (পৃষ্ঠা ৪৩)। ১৯৮৮ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও 'পরীক্ষা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি বর্তমানে এক গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করেছে' বলে মন্তব্য করে। (পৃষ্ঠা ২৫৫)।

১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে দেশের পরীক্ষার্থীর হার পূর্বতন সংখ্যার তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এত বিপুল সংখ্যায় পরীক্ষার্থী সামাল দিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যার পরিমাণ এখন থেকে আরো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। কারণ দেশের শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে, দ্রুতই পাবলিক পরীক্ষায় এর প্রচণ্ড চাপ আরো অনুভূত হবে।

এই পটভূমিতে বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষায় সমস্যাগুলো আরো প্রকট হতে চলেছে। এর কারণ ১. নকলের ট্রেনিং ছাত্ররা নিচ্ছে যার যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষাগুলোতেই, শিক্ষকরা কিছু বলছেন না ২. বোরখা-মুড়ি দিয়ে ধার্মিক মা নিজের সন্তানকে নকল সরবরাহ করতে আসছেন (এ সম্পর্কিত সরজমিন প্রতিবেদন দেখুন সংবাদ ৩রা জুন ১৯৯৮ এবং দৈনিক ইত্তেফাক ৩১শে মে ১৯৯৮)। ৩. অযৌক্তিক কারণে পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন বেড়ে চলেছে। ৪. প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে অথবা ফাঁসের গুজব জোরদার হচ্ছে (১৯৯৮ সাল থেকে সরকারের কঠোর পদক্ষেপে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা আপাতত বন্ধ হয়েছে বলে মনে হয়)। ৫. রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কারণে স্থাপিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রধান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৬. এসব কেন্দ্রে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং শিক্ষকরা একযোগে চোখ উল্টে রেখেছেন নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ৭. পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দুর্নীতি পূর্বের তুলনায় আরো বেড়েছে। ৮. নোটবইগুলো পূর্বের তুলনায় আকৃতিতে ছোট হয়ে এসেছে নকল করতে অধিকতর সুবিধা দেয়ার জন্যে।

এই অচলায়তন কি কেউ একা ভাঙতে পারবে নাকি কেউ কখনো পেরেছে! এর জন্যে যে সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন তার ডাক দেবে কে? যে দেশের তরুণরা পাকিস্তানের বাঘা বাঘা বলে খ্যাত মিলিটারিদের এমনভাবে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল, সে দেশের তরুণরা নকলের মতো ঘৃণ্য একটা ক্ষুদ্র অপশক্তিকে পরাজিত করতে পারবে না!